অচলায়তন।

BENGAL LIBRARY
13 AUG 1912
WRITERS' BUILDINGS

RARE BOOK

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4137
DATE 9. 9. 09
CALCUTTA

মূল্য ৸৹ আনা।

IMPERIAL LIBRARY
26.JUN.13.

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসম
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অচলায়তন

১

অচলায়তনের গৃহ।

পঞ্চক

(গান)

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানেনা,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানেনা।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানেনা।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

গান ! আবার গান !

পঞ্চক

দাদা, তুমি ত দেখ্‌লে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার আচমন সূত্র বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক

সেত দেখ্‌তে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ ক... বিষয় ? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে ?

পঞ্চক

একমাত্র ঐটেই যে পারি !

মহাপঞ্চক

পারি ! ভারি অহঙ্কার ! গান ত পাখীও গাইতে পারে ! ... বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না তার কি করলে ?

পঞ্চক

সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেই রকম। একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক

খারাপ ! তার মানে কি হল !

পঞ্চক

জিনিষটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগ্‌চেনা, ভু...

করছি—ভুল যতই বেশিবার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্চে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্চি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাৎ হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক

সেই তফাৎটা ঘোচাতে হবে, নির্ব্বোধ!

পঞ্চক

সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মত করে নাও! নইলে, আমিত পারব না।

মহাপঞ্চক

পারবে না কি! পারতেই হবে!

পঞ্চক

তা হলে আর একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি—একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক

আচ্ছা, বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও! ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসঃ স্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক

ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—আচ্ছা দাদা!

মহাপঞ্চক

আবার দাদা! মন্ত্রটা শেষ কর বলচি!

পঞ্চক

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ মন্ত্রটার ফল কি!

মহাপঞ্চক

এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক

রক্ষা কর দাদা! এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়—দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি!

মহাপঞ্চক

আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক

লজ্জার ত কোনো কারণ নেই দাদা!

মহাপঞ্চক

কারণ নেই?

পঞ্চক

না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক

এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখ পঞ্চক, তুমিত আর বালক নও—তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পঞ্চক

তাইত বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উল্টো দিকে চলে, অথচ তার জন্তে যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক

পিতার মৃত্যুর পর কি দরিদ্র হয়ে, সকলের কি অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি, আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না!

পঞ্চক

সচেষ্ট করবার ত কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার ত কিছুমাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক

ঐ শঙ্খ বাজ্‌ল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি সময় নষ্ট কোরোনা!

[প্রস্থান]

পঞ্চক

(গান)

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ ত হানেনা!

আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ ত জানেনা।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানেনা।

(ছাত্রদলের প্রবেশ)

প্রথম

ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক

না ভাই, আমাকে বিরক্ত করো না।

দ্বিতীয়

কেন? হল কি তোমার?

পঞ্চক

ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয়

এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না? ওযে আমাদের কোন্‌কালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আন্‌তে পারিনে।

প্রথম

না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে ওর কি গতি হবে। এখনো ও বেচারা তট তট করে মরচে—আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়

আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখনি ?

পঞ্চক

না।

তৃতীয়

মরীচী ?

পঞ্চক

না।

প্রথম

মহামরীচী ?

পঞ্চক

না।

দ্বিতীয়

পর্ণশবরী ?

পঞ্চক

না।

দ্বিতীয়

আচ্ছা বল দেখি হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পঞ্চক

আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখিনি ত তার নখাগ্রের ধূলিকণা !

প্রথম

হরেত পক্ষী ত আমরাও কেউ দেখিনি—শুনেছি সে দধি-সমুদ্রের

পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে—কিন্তু এ সমস্ত ত জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে ত চলবে না।

দ্বিতীয়

পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না! তোমার কাছে ত কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চু-পরীক্ষা, ছাগলোম-শোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন - এগুলো ত জানা চাইই—নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন লজ্জায়?

তৃতীয়

চল বিশ্বম্ভর! আমরা যাই, ও একটু পড়ুক!

[গমনোদ্যত]

পঞ্চক

ওহে বিশ্বম্ভর! তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর

কেন? আবার ডাক কেন?

পঞ্চক

সঞ্জীব, জয়োত্তম! তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব

কি হয়েছে! পড়না।

পঞ্চক

দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়োনা! ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান্ জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম

না হে, মহাপঞ্চক বড় রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক

আমি যে কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না এতেই আমি বড় দুঃখিত হই! আচ্ছা ভাই তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্ত্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। ক্ষট ক্ষট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম

আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসচি।

সঞ্জীব

বিশ্বম্ভর, তুমি যে বল্লে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আস্‌বেন সেটা শুনলে কার কাছ থেকে?

বিশ্বম্ভর

কি জানি, কারা সব বলাকওয়া করছিল। কেমন করে চারিদিকেই রটে গিয়েছে যে চতুর্মাস্যের সময় গুরু আস্‌বেন।

পঞ্চক

ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি? আমাদের গুরু আসবেন না কি?

সঞ্জীব

আবার পঞ্চক! তোমার কাজ তুমি কর না!

পঞ্চক

ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

কিন্তু অধ্যাপকদের কারো কাছে শুনেছ কি? মহাপঞ্চক কি বলেন?

বিশ্বম্ভর

তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা! মহাপঞ্চক কারো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্য্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন—তাঁর কাছে ঘেঁষে কে!

পঞ্চক

চলনা ভাই, আচার্য্যদেবের কাছে যাই—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম

আবার, ফের!

পঞ্চক

ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

আমার ত উনিশ বছর বয়স হল—এর মধ্যে একবারো আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেননি। আজ তিনি হঠাৎ আস্‌তে যাবেন এটা বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে।

সঞ্জীব

তোমার তর্কটা কেমনতর হল হে, জয়োত্তম? উনিশ বছর আসেননি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে?

বিশ্বম্ভর

তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে ত উনিশ পর্য্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাক্‌তে পারে না।

সঞ্জীব

শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্ত্তে ঘটেনি, তা ও মুহূর্ত্তেই বা ঘটে কি করে?

জয়োত্তম

আরে! ঐটেই ত আমার তর্ক! কে বল্লে ঘটে? যা পূর্ব্বে ঘটেনি তা কিছুতেই পরে ঘট্‌তে পারে না। আচ্ছা, এস, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও!

পঞ্চক

(জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া)

প্রমাণ? এই দেখ প্রমাণ! ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

আঃ পঞ্চক! কর কি! নাব বলচি! আঃ নাব!

পঞ্চক

আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাব্‌চিনে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

পঞ্চক! তুমি বড় উৎপাত করচ!

পঞ্চক

দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় ফট ফট—

মহাপঞ্চক

তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ্য জুটলেই তোমাকে সম্বরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর

দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুন্‌তে পাচ্চি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আস্‌বেন!

মহাপঞ্চক

আস্‌বেন কিনা তা নিয়ে আন্দোলন না করে' যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক

তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এদিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয় ত মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক

ভারি বুদ্ধিমানের মতই কথা বল্লে!

পঞ্চক

অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে—এ ত সোজা কথা! আমার ভয় হয় গুরু এসে হয় ত দেখ্‌বেন আমরা যেদিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিক্‌টা উল্টো। সেইজন্যে আমি কিছু করিনে।

মহাপঞ্চক

পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক

তর্ক করতে পারিনে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগো!

মহাপঞ্চক

যাও তুমি।

পঞ্চক

যাচ্ছি, কিন্তু বলনা গুরু কি তাই আসবেন ?

মহাপঞ্চক

তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন।

[প্রস্থান]

সঞ্জীব

মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কথনই শুনিনি।

জয়োত্তম

কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়, আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক

সেই জন্যেই উপাধ্যায় মহাশয় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম

কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল, তাতেই—

পঞ্চক

হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর

দেখ পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তা হলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব

আটান্ন প্রকার আচমন-বিধির মধ্যে পঞ্চক বড় জোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক

সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না! অত্যুক্তি করচ!

সঞ্জীব

অত্যুক্তি!

পঞ্চক

অত্যুক্তি নয় ত কি! তুমি বল্‌চ পাঁচটা শিখেছি! আমি ছটোর বেশি একটাও শিখিনি! তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্ব্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাস্‌চ কেন? বিশ্বাস করচনা বুঝি?

জয়োত্তম

বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক

সেদিন উপাধ্যায় মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জ্জনী তুল্লেন, আমার আর এগল না।

বিশ্বম্ভর

না, পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক

পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে। ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না!

সঞ্জীব

তোমার সেই গুণে উপাধ্যায় মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা ত বোধ হয় না।

পঞ্চক

আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিদ্যাসম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই—ঐ যাকে বলে ধ্রুব নক্ষত্র—তাতে সুবিধা এই যে এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে!

জয়োত্তম

তোমার আশ্চর্য্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায় মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক

না, কিছু না—তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হল।

সঞ্জীব

আমরা যদি উপাধ্যায় মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তাহলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক

তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভা-

বিক যে সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুসি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই। এমনি তোমরা হতভাগ্য!

জয়োত্তম

যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকোনা! আমরা চল্লুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়!

[তিনজনের প্রস্থান]

পঞ্চক

হবে না, আমার কিছুই হবে না! এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

(গান)

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে!
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে!
যেপথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে!

ওকি ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে।

[প্রস্থান]

(বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃ প্রবেশ)

পঞ্চক

তোর কোন ভয় নেই্ ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্—কি হয়েছে বল্!

সুভদ্র

আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক

পাপ করেছিস্? কি পাপ?

সুভদ্র

সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না! ভয়ানক পাপ! আমার কি হবে!

পঞ্চক

তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র

আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক

উত্তর দিকের?

সুভদ্র

হাঁ, উত্তরদিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক

জান্‌লা খুলে কি করলি?

সুভদ্র

বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক

দেখে ফেলেছিস্? শুনে লোভ হচ্ছে যে!

সুভদ্র

হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনি বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক

ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আস্‌তুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাক্‌ত—আমি আসার পর প্রায় তার সবকটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখ্‌তে পারিনি।

(বালকদলের প্রবেশ)

প্রথম

আঁা, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়

জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কি ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক

চুপ্ চুপ্! ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদ্‌চিস্ কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাক্‌লে ত মানুষ টিক্‌তেই পারত না।

প্রথম

(চুপি চুপি)

জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক

আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মত তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয়

আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়

সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে—

পঞ্চক

তাহলে কি?

তৃতীয়

সে যে ভয়ানক!

পঞ্চক

কি ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়

জানিনে, কিন্তু সে ভয়ানক!

সুভদ্র

পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা! আমার কি হবে?

পঞ্চক

শোন্‌ বলি সুভদ্র, কিসে কি হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে— কিন্তু যাই হোক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র

ভয় কর না?

পঞ্চক

ভয়ানক না হলে মজা কিসের ?

তৃতীয়

সে যে ভয়ানক পাপ !

প্রথম

মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। কেন না, উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর !

পঞ্চক

মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম সেই মজাটা কি রকম, দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম

তোমার ভয় করবে না ?

পঞ্চক

কিছু না। ভাই সুভদ্র তুই কি দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়

না, না, বলিস্‌নে !

তৃতীয়

না, সে আমরা শুন্‌তে পারবনা—কি ভয়ানক !

প্রথম

আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্ ভাই !

সুভদ্র

আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরচে—

বালকগণ

(কাণে আঙুল দিয়া)

ও বাবা, না, না, আর শুন্‌বনা! আর বোলোনা সুভদ্র! ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আস্‌চেন। চল্ চল্—আর না!

পঞ্চক

কেন? এখন তোমাদের কি?

প্রথম

বেশ, তাও জাননা বুঝি? আজ যে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক

তাতে কি?

দ্বিতীয়

আজ কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবেনা?

পঞ্চক

কেনরে?

প্রথম

তুমি কিছু জাননা পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার ল্যাজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে!

দ্বিতীয়

আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আস্‌বেন!

পঞ্চক

তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম বালক

পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য !

[বালকগণের প্রস্থান

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

উপাধ্যায়

পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখ্‌তে পাই।

পঞ্চক

এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড় হলেই আর তখন—

উপাধ্যায়

কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠ্‌চে। সেদিন পটুবর্ম্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক

তা দিয়েছে বটে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়

সে আমি:অনুমানেই বুঝেছি নইলে এত বড় আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন? শুনেছি তুমি না কি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্ত পটুবর্ম্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশোবার হাই তুল্‌তে বলেছিলে?

পঞ্চক

আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়

ভুল শুনেছি?

পঞ্চক

একলা পটুবর্ম্মকে নয় সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম—পক্ষপাত করিনি।

উপাধ্যায়

প্রত্যেককেই ডেকেছিলে?

পঞ্চক

প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জান্‌বেন। কেউ সাহস করে এগল না। তারা হিসেব করে দেখ্‌লে পনেরোজন ছেলেতে মিলে দেড় শো হাই তুল্লে তাতে আমার সমস্ত আয়ুক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্বৃত্তটাকে নিয়ে যে কি হবে তাই স্থির কর্‌তে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই ত আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়

দেখ, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এত দিন অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর চল্‌বেনা। আমাদের গুরু আস্‌চেন শুনেছ?

পঞ্চক

গুরু আসচেন? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন?

উপাধ্যায়

হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের ত কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক

আমারই ত গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয়নি।

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র

উপাধ্যায় মশায়!

পঞ্চক

আরে পালা পালা! উপাধ্যায় মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনচি এখন বিরক্ত করিস্‌নে, একেবারে দৌড়ে পালা!

উপাধ্যায়

কি সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কি শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র

আমি ভয়ানক পাপ করেছি!

পঞ্চক

ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বল্‌চি!

উপাধ্যায়

(উৎসাহিত হইয়া)

ওকে তাড়া দিচ্চ কেন? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক

আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মত ছোটে।

উপাধ্যায়

কি বল্‌ছিলে ?

সুভদ্র

আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়

পাপ করেছ ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বস। শোনা যাক্।

সুভদ্র

আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়

বল, বল, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ ?

সুভদ্র

না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়

বুঝেছি কুনুই ঠেকিয়েছ ? তাহলে ত সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জান্‌লা না চাটাতে পার্‌লে শোধন হবে না।

পঞ্চক

এটা আপনি ভুল বলচেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়

তোমার ত স্পর্দ্ধা কম দেখিনে! কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনো দিন খুলে দেখা হয়েছে ?

পঞ্চক

(জনান্তিকে)

সুভদ্র যাও তুমি !—কিন্তু কুলদত্তকে ত আমি—

উপাধ্যায়

কুলদত্তকে মান না ? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি ত মান্‌তেই হবে,—তাতে—

সুভদ্র

উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি !

পঞ্চক

আবার ! সেই কথাই ত হচ্চে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়

সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার ?

সুভদ্র

আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়

(বসিয়া পড়িয়া)

আঃ সর্ব্বনাশ ! করেছিস্ কি ? আজ তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলেনি তা জানিস্ ?

সুভদ্র

আমার কি হবে ?

পঞ্চক

(সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া)

তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র! তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ! তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায় মশায়ের মুখে আর কথা নেই!

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

উপাধ্যায়

জানিনে কি সর্ব্বনাশ হবে! উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্ত্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাব্‌চি! যাই আচার্য্যদেবকে জানাইগে!

[প্রস্থান]

(আচার্য্য ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

এতকাল পরে আমাদের গুরু আস্‌চেন।

উপাচার্য্য

তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য্য

প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে! হয়ত প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জান্‌ব?

উপাচার্য্য

নইলে তিনি আস্‌বেন কেন?

আচার্য্য

এক এক সময়ে মনে ভয় হয় যে হয়ত অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আস্‌চেন।

উপাচার্য্য

না, আচার্য্য দেব, এমন কথা বল্‌বেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করিছি—কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য্য

কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য্য

বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তরবার পূর্ণ হয়েছে। আর কোন আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়?

আচার্য্য

না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য্য

কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্চে কেন?

আচার্য্য

দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্চে সে কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখ সুতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠ্‌চে, কাউকে বল্‌তে পারচিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন কর্ত্তে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যে দিন পত্র পেয়েছি গুরু আস্‌চেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখ্‌তে পারচিনে। সে কেবলি আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠ্‌চে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা!

উপাচার্য্য

আচার্য্যদেব, বলেন কি! বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য্য

সুতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য্য

সময় ঠিক করে বলা বড় কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠ্‌তে বয়সের দরকার হয় না। আমার ত মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য্য

দেখ সুতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠ্‌ছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু একটা আছে। আজ গুরু আস্‌বেন শুনে হঠাৎ মনটা থম্‌কে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই ত পড়া হল, সব ব্রতই ত পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ কি পেয়েছিস্? কিছু না, কিছু না, সুতসোম! আজ দেখ্‌ছি—এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য্য

বোলোনা, বোলোনা, এমন কথা বোলোনা! আচার্য্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল?

আচার্য্য

সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য্য

আমার ত একমুহূর্ত্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য্য

অশান্তি নেই ?

উপাচার্য্য

কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মত বজ্রের মত শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কি হতে পারে ?

আচার্য্য

না, না, তবে আমি ভুল করছিলুম সুতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে, এই ঠিক এই-ই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য্য

সেই জন্যেই ত অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে—শান্তি চলে যায়।

আচার্য্য

ঠিক্, ঠিক্,—ঠিক বলেছ সুতসোম! অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব! এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এইত নিশ্চল শান্তি! গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়োনা, কিছু আঘাত কোরোনা—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা

ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের! আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এম্‌নি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলোনা যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই!

উপাচার্য্য

আচার্য্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কথনো দেখিনি।

আচার্য্য

কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্চে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্চে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্য্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারচনা সূতসোম?

উপাচার্য্য

কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমাদের ত বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্য্যাপ্ত।

আচার্য্য

আজ আমার একটু একটু মনে পড়চে বহু পূর্ব্বে সব প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই—তিনি পুঁথি নন্, শাস্ত্র নন্, বৃত্তি নন্, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম—এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চল্‌চে—কিন্তু—

উপাচার্য্য

ঠিক আছে, ঠিকই চল্‌চে, আচার্য্যদেব, ভয় নেই! প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিইনি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বল্‌তে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্ব্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য্য

সর্ব্বনাশই ত!

উপাচার্য্য

তা হলে হবে কি! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠ্‌তে হবে?

আচার্য্য

আমি ত তাই সাম্‌নে দেখ্‌চি। সে কি আমার স্বপ্ন? অথচ আমার ত মনে হচ্চে এই সমস্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন!

উপাচার্য্য

ঐযে পঞ্চক আস্‌চে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কি করে সম্ভব হল? শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেলনা। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

আচার্য্য

আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্য্যের প্রস্থান]

(পঞ্চকের প্রবেশ)

আচার্য্য

(পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া)

বৎস, পঞ্চক!

পঞ্চক

করলেন কি? আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য্য

কেন, বাধা কি আছে?

পঞ্চক

আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য্য

কেন পারনি বৎস?

পঞ্চক

প্রভু, কেন, তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য্য

সৌম্য, তুমি ত জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুসি তাকে কি ভাঙ্‌তে পারি?

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য্য

নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন?

পঞ্চক

আমি কোনো তর্ক করবনা। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তাহলে পালন করব। আমি আচার অনুষ্ঠান কিছুই জানিনে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য্য

আদেশ করব—তোমাকে? সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বেনা।

পঞ্চক

কেন আদেশ করবেন না প্রভু?

আচার্য্য

কেন? বল্‌ব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখ্‌তে পাই। এত চাপেও যখন দেখ্‌লুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা।

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য্য

কেমন করে বৎস ?

পঞ্চক

তা জানিনে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য্য

তুমি কি কর না কর আমি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু জাতির সঙ্গে মেশ ?

পঞ্চক

আপনি কি এর উত্তর শুন্‌তে চান ?

আচার্য্য

না, না, থাক্, বোলোনা। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক

তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য্য

না, না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করগে—তুমি ভুল করগে—আমাদের কথা শুনোনা। আমাদের গুরু আস্‌চেন পঞ্চক—তাঁর কাছে তোমার মত বালক হয়ে যদি বস্‌তে পারি—তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন,

তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জান্‌বার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দুহাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন!

পঞ্চক

ঐ উপাচার্য্য আস্‌চেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান]

(উপাধ্যায় ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

উপাচার্য্য

(উপাধ্যায়ের প্রতি)

আচার্য্যদেবকে ত বল্‌তেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য্য

উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়

অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য্য

অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য্য

উপাধ্যায় কথাটা বলে ফেল। এদিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। আমাদের গ্রহাচার্য্য বল্‌চেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা কিছু করবার সময়—সেটা অতিক্রম করলেই গো-পরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্দ্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়

আচার্য্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য্য

উত্তরদিকটা ত একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়

সেইত ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা ত যায় না।

উপাচার্য্য

এখন কথা হচ্চে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আচার্য্য

আমার ত স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়

না, আমিও ত মনে আন্‌তে পারিনে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি—সবাই ভুলেই গেছে। ঐ যে মহাপঞ্চক আস্‌চে—যদি কারো জানা থাকে ত সে ওর্।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

উপাধ্যায়

মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক

সেই জন্যেই ত এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য্য

এর প্রায়শ্চিত্ত কি, আমাদের কারো স্মরণ নেই—তুমিই বলতে পার।

মহাপঞ্চক

ক্রিয়া-কল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান্ জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণে লিখ্‌চে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য্য

মহাতামস?

মহাপঞ্চক

হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখ্‌তে পাবে না। কেন না আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য্য

তাহলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়

চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দ্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনিগে।

[সকলের গমনোদ্যম]

আচার্য্য

শোন, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়

কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য্য

প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক

প্রয়োজন নেই বল্‌চেন! আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্চি—

আচার্য্য

দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক

এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোন শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য্য

না, হতে দেবনা, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়

এ রকম দুর্ব্বলতা ত আপনার কোনো দিন দেখিনি। এই ত সে বার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন ত আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মবিধি ত চিরকালের।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক

ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু!

আচার্য্য

বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্চে পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান]

উপাধ্যায়

এ কি হল উপাচার্য্য মশায় ?

মহাপঞ্চক

আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাক্‌ল, এ ত সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়

এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান্ ?

মহাপঞ্চক

উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্ম্মকে বিনাশ করবেন! এ কি রকম বুদ্ধি-বিকার ওঁর ঘটল ? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য্য বলে গণ্য করাই চল্‌বে না।

উপাচার্য্য

সে কি হয় ? যিনি একবার আচার্য্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক

উপাচার্য্য মশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য্য

নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়

আজ বিপদের সময় বয়স বিচার!

উপাচার্য্য

ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার কর। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্য্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক

কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্য্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য্য হবার অধিকার।

উপাচার্য্য

মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর-দিকের জানালা খোলার চেয়ে কম পাপ!

[প্রস্থান]

মহাপঞ্চক

চল উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাক্‌বেন ততক্ষণ ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড় মাঠ।

(পঞ্চকের গান)

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে!
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে!

(পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য)

পঞ্চক

ও কিরে! তোরা কখন্ পিছনে এসে নাচ্‌তে লেগেছিস্।

প্রথম শোণপাংশু

আমরা নাচ্‌বার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখ্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক

আরে না না, আমাকে ছুঁস্‌নেরে ছুঁস্‌নে!

তৃতীয় শোণপাংশু

ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে! শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক

জানিস্, আমাদের গুরু আস্‌বেন?

প্রথম শোণপাংশু

সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কি রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক

নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখ্‌ব তাঁকে।

পঞ্চক

তোরা দেখ্‌বি কিরে! সর্ব্বনাশ! তিনি ত শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সে জন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও ত গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু

গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা ত হলুম দাদা-ঠাকুরের দল। এ পর্য্যন্ত আমরা ত কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু

সেই জন্যেই ত ও জিনিষটা কি রকম দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কি জানি ভারি

লোভ হয়েছে ; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য্য কি একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু

কিন্তু শোণপাংশু বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয় সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাওনা বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু

কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক

বলতে পারি নে—কি জানি যদি অপরাধ নেন্! ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস্—সেইটে যে বড় দোষ! তোরা চাষ করিস ত?

প্রথম শোণপাংশু

চাষ করি বই কি, খুব করি! পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি!

(গান)

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

পঞ্চক

আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস্ সেও কোনো মতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বল্‌ছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস্ ?

প্রথম শোণপাংশু

করি বই কি।

পঞ্চক

কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস্ বুঝি ?

তৃতীয় শোণপাংশু

কেন করব না! এখান থেকেইত কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক

তা ত যায়, কিন্তু জানিস্ নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম শোণপাংশু

কেন ?

পঞ্চক

কেন কি রে ? ওটা যে নিষেধ!

প্রথম শোণপাংশু

কেন নিষেধ ?

পঞ্চক

শোন একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিস্‌নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ!

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন? ওটা কি তোমরা খাওনা?

পঞ্চক

খাই বইকি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াইনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন?

পঞ্চক

ফের কেন! তোরা যে এত বড় নিরেট মূর্খ তা জান্‌তুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে খবর রাখিস্‌নে বুঝি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক

আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুল্লি!

তৃতীয় শোণপাংশু

আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক

একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনি সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের

সমস্ত খোঁসারিডালের ক্ষেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড় তেজ! তোরা হলে কি করতিস্ বল দেখি!

প্রথম শোণপাংশু

আমাদের কথা বল কেন! উপবাসের দিনে খোঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম শোণপাংশু

লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি!

পঞ্চক

রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা পিতলের কাজ করে আস্‌চি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটনো সে ত হতেই পারে না!

তৃতীয় শোণপাংশু

আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

(গান)

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে!

লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনুরে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনুরে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনুরে।

পঞ্চক

সেদিন উপাধ্যায় মশায় একঘর ছাত্রের সাম্‌নে বল্লেন শোণপাংশু জাতটা এমনি বিশ্রী যে তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বল্লুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করেনি সে আমি জানি—এমন কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ঐ মূর্খেরা জানে না, আবার সে কথা বল্‌তে গেলে মারতে আসে,—তাই বলে ভালমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে লোহার কাজ নিজের হাতে করবে! আজ ত স্পষ্টই দেখ্‌চে পাচ্চি যার যে বংশে জন্ম তার সেই রকম বুদ্ধিই হয়!

প্রথম শোণপাংশু

কেন, লোহা কি অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক

আরে ওটা যে লোহা সে ত তোকে মান্‌তেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু

তা ত হবে।

পঞ্চক

তবে আর কি—এই বুঝে নে না !

দ্বিতীয় শোণপাংশু

তবু একটা ত কারণ আছে !

পঞ্চক

কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে। যা হোক ভাই তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য্য করে দিলিরে ! তোরা ত খেঁসারিডাল চাষ করচিস্ আবার লোহাও পিটচ্চিস্, এখনো তোরা কোনো দিক্ থেকে কোনো পাঁচ চোক কিম্বা সাত মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি ?

প্রথম শোণপাংশু

যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে তারও কোপ বড় কম নয় !

পঞ্চক

আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

মন্ত্র ! কিসের মন্ত্র ?

পঞ্চক

এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট্ তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু

ওর মানে কি ?

পঞ্চক

আবার! মানে! তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস্?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

মরীচী?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস্ কি?

তৃতীয় শোণপাংশু

সেদিন নাপিতের দুইগালে চড় কসিয়ে দিই।

পঞ্চক

না রে না, আমি বল্‌চি সেদিন নদীপার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকয় উঠ্‌তে পারিস্‌?

তৃতীয় শোণপাংশু

খুব পারি।

পঞ্চক

ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলিরে! আমি আর থাক্‌তে পারচিনে! তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্চে না; এমন জবাব যদি আর একটা শুন্‌তে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মত নাচব, আমার জাতমান কিছু থাক্‌বেনা। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস্‌? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

(শোণপাংশুগণের গান)

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই!
বাঁধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,

আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ করলেরে-আমার সর্ব্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না! এদের তালে তালে আমারো পা দুটো নেচে উঠ্‌চে! আমাকে সুদ্ধ এরা টান্‌বে দেখচি। কোন দিন আমিও লোহা পিটবরে লোহা পিটব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না, না, পালা ভাই, পালা তোরা! দেখচিস্‌নে পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ও কি পুঁথি দাদা? ওতে কি আছে?

পঞ্চক

এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে!

প্রথম শোণপাংশু

কি রকম?

পঞ্চক

দশটা দিকের দশ রকম রঙ্‌ গন্ধ আর স্বাদ আছে কিনা এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণদিকের রংটা হচ্চে রুইমাছের পেটের মত, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি; পূবদিকের রংটা হচ্চে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মত, স্বাদটা বকুলের ফলের মত কষা,—নৈঋৎ কোণের—

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আর বল্‌তে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে ত আমরা এসব রং গন্ধ দেখ্‌তে পাইনে।

পঞ্চক

দেখ্‌তে পেলে ত দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখ্‌ত। এ সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায় জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু

তা হলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়, আমরা চল্লুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

এদের মত চোখ কান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে ত আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু

চল ভাই ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে।

[প্রস্থান]

পঞ্চক

এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখ্‌তেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দ্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেচে অম্‌নি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখচি ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না—ওরা নিজের গোলমাল্‌টা শোনে সেই জন্যে এত গোল কর্‌তে ভালবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্চে আমার সমস্ত শরীরটা গুন্‌ গুন্‌ করে বেড়াচ্চে!

(গান)

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন গগনে
মাধবী জাগ্‌ল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় বুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুণিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

(শোণপাংশুদলের পুনঃ প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আস্‌চে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

এখন রাখ তোমার পুঁথি রাখ—দাদাঠাকুর আস্‌চে।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর

কিরে!

দ্বিতীয় শোণপাংশু

দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর

কি চাইরে!

তৃতীয় শোণপাংশু

কিছু চাইনে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্চি।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর

কি ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক

ওরা সবাই তোমায় ডাক্‌চে, আমারও কেমন ডাক্‌তে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশবনা ততই আরো জড়িয়ে পড়চি।

প্রথম শোণপাংশু

আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের! উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

(গান)

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর!
এই আমাদের মজার মানুষ

দাদাঠাকুর !

এই ত নানা কাজে,
এই ত নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর!

সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর !

এই ত হাসির দলে,
এই ত চোখের জলে,
এই ত সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর !

এই ত ঘরে ঘরে,
এই ত বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর !

এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর !

পঞ্চক

ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা ত দিনরাত মাতামাতি করছিস্ একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখ্‌ব না।

প্রথম শোণপাংশু

নিয়ে যাওনা! সে ত ভালই হয়! তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে। ✓

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আচ্ছা আয় ভাই আমাদের কাজগুলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বসুক।

[প্রস্থান]

পঞ্চক

ঐ শোণপাংশুগুলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধুলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখ্‌লে হেসে অস্থির হত তাই ওদের সাম্‌নে করিনে।

দাদাঠাকুর

দরকার কি ভাই পায়ের ধুলোয়?

পঞ্চক

নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে উঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে—ভক্তি না করে যে বাঁচিনে।

দাদাঠাকুর

ভাই, আমিও থাক্‌তে পারিনে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরেনা, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক

অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হ'য়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোট করেছি, বড়কে পাইনি।

দাদাঠাকুর

এই আমার সবারবাড়া বড়র মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা কবি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করচে এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, তোমার ঐ চোখ দিয়ে এই যে তুমি কেবল সেই বড়কে দেখ্‌চ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন পশু পাখী গাছ পালা আমার কাছে আর কিছুই ছোট থাকে না। এমন কি, তখন ঐ শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি কর্‌তেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর

আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরণার ধারার সঙ্গে খেল্‌চি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেল্‌চি।

পঞ্চক

তোমার কাছে সবই বড় হ'য়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর

না ভাই, বড় হয়নি, সত্য হয়ে উঠেচে—সত্য যে বড়ই, ছোটই ত মিথ্যা।

পঞ্চক

তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে।

এমন হাস্‌তে খেল্‌তে মিলতে মিশতে কাজ কর্‌তে কাজ ছাড়্‌তে কে পারে! তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছটফট কর্‌তে থাকে। ঐ যে কি একটা আছে—চরম, না পরম, না কি তা কে বল্‌বে—তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন-কেমন করে। থেকে থেকে এক একবার চম্‌কে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনচি আমাদের গুরু আস্‌বেন।

দাদাঠাকুর

গুরু! কি বিপদ! ভারি উৎপাত কর্‌বে তা হলে ত!

পঞ্চক

একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে।

দাদাঠাকুর

তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্চে না?

পঞ্চক

আমার ভয় সব চেয়ে কম—আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর

হবে না?

পঞ্চক

একেবারে কিছুই জানিনে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাক্‌ব।

দাদাঠাকুর

আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলত?

পঞ্চক

ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর! মনে মনে প্রার্থনা করচি গুরু এসে যেদিকে হোক্ একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয়ত খুব কসে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই!

দাদাঠাকুর

তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান না কেন তার নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আন্তে পারব।

পঞ্চক

তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখ ঠাকুর একটা কথা তোমাকে বলি—অচলায়তনের মধ্যে ঐ যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেই জন্যে বড় নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারো একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারো মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার শাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতে হুঁফট্ স্বাহা" এর কারণটা কি—তাহলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর একমাষা সোনা হাতে করে যাও তখনি মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ

হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চক-দাদার টিকি দেখবার জো নেই—বাঁধা জবাব পাই কার কাছে! সব কথারই বারো আনো বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে—তারপর?

দাদাঠাকুর

তার পরে?

(গান)

যা হবার তা হবে!
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে!
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই ত ঘরে লবে।

পঞ্চক

এত বড় ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্চ ঠাকুর? তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখ্‌তে দেবে না! অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যু-ভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়চি, শত্রু-ভয়ের জন্যে মহাসাহস্র-প্রমর্দ্দিণী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহ-মাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ঙ্করী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারি, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ড-ভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব!

দাদাঠাকুর

আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক

তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর ?

দাদাঠাকুর

পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয়নি।

পঞ্চক

সে কি রকম ?

দাদাঠাকুর

যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনি বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি কিন্তু তোমার ঐ বন্ধু পর্য্যন্ত যেতে সাহস কর্ত্তে পারচিনে।

দাদাঠাকুর

কেন, তোমার ভয় কিসের ?

পঞ্চক

খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার

বুক দুরদুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কি করে ? আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর

তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর—কিন্তু সিন্ধুকে যে আছে কি তার খোঁজ রাখনা !

পঞ্চক

আমার দাদা বলে, জগতে যা কিছু আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিষটিকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করচি—আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব —সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্চে না।

দাদাঠাকুর

তোমার দাদা ত ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনি আসল জিনিষকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারিনে—দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না ?

পঞ্চক

আমি জানি যে আমাদের আচার্য্য জানেন। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি—তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না আমিও বলিনে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখ্‌লেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কি ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন্। ঠাকুর,

যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর

সেদিন আমারও শুভ দিন হবে।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড় অস্থির করে তুলেছ। এক এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনো দিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর

আমিই কি স্থির আছি ভাই? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলচি।

পঞ্চক

কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই শান্তি কোথায়! আমি ত দেখিনে।

দাদাঠাকুর

ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক

তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায়?

দাদাঠাকুর

এই পাগল যে পাগল হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে ক্ষ্যাপায় কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেইমন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক

ঢেউ তোলো ঠাকুর ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলচি আমার মন ক্ষেপেছে, কেবল জোর পাচ্চিনে—তাই দাদাঠাকুর মন কেবল তোমার কাছে আস্‌তে চায়—তুমি জোর দাও—তুমি জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না!

(গান)

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে!
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে!
তুমি ডাক এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে!
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে;
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরাণ কেঁদে উঠে!

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? তুমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন?

দাদাঠাকুর

তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক

কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোখের জল ফেল্‌তে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাওনা?

দাদাঠাকুর

যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়েনা সেখানে খাল কেটে জল আন্‌তে হয়। ওদের রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে বয়ে আন্‌বে। কিন্তু দেখেচি ওর বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকমই ওদের স্বভাব!

পঞ্চক

ঠাকুর, আমি ত সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার ত সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুন্‌তে পাচ্চ। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

দাদাঠাকুর

(গান)

বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ!
এবার ধর দেখি তোর গান!

ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কি আনন্দ যে লাগ্‌চে সে আমি বলে উঠতে পারিনে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাক ডাক, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেল!

(গান)

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো!
যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো!

শুনচ দাদা, ঐ কাঁসর বাজচে।

দাদাঠাকুর

হাঁ বাজ্‌চে।

পঞ্চক

আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর

কেন?

পঞ্চক

আজ আমাদের দীপকেতন পূজা!

দাদাঠাকুর

কি করতে হবে?

পঞ্চক

আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তারপরে সেই মাটিতে ছোট ছোট মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্য্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর

ফল কি হবে?

পঞ্চক

প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে

দাদাঠাকুর

যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক

তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চল্লুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানিনে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চল্লুম—এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধান আলগা করে দেবে! ঐ আসচে শোণপাংশুর দল—আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভাল লাগ্‌চে না, ওরা ছটফট্ করচে। তোমাকে নিয়ে ওরা ছুটোপাটি করতে চায়—করুক, ওরাই ধন্য—ওরা দিন রাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর

ছুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায় ? কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

ও কি ভাই পঞ্চক, যাও কোথায় ?

পঞ্চক

আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

বাঃ সে কি হয়! আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়চিনে।

পঞ্চক

না, ভাই, সে হবে না—ঐ কাঁসর বাজচে।

তৃতীয় শোণপাংশু

কিসের কাঁসর বাজচে ?

পঞ্চক

তোরা বুঝবিনে। আজ দীপকেতন পূজা—আজ ছেলেমানুষি না। আমি চল্লুম।

(কিছু দূরে গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

(গান)

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে!
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।

ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু

বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তাহলে চল আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক

বেশ, চল।

(একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া)

কিন্তু ভাই ঐ বন পর্য্যন্তই যাব ভোজন পর্য্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের!

পঞ্চক

না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবেনা।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন চলবেনা? চালালেই চলবে।

পঞ্চক

চালালেই চলে এমন কোনো জিনিষ আমাদের ত্রিসীমানায় আস্‌তে পারেনা তা জানিস্‌। মারলে চলেনা, ঠেল্‌লে চলেনা, দশটা হাতী জুড়ে দিলে চলেনা, আর তুই বলিস্‌ কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশু

আচ্ছা ভাই, কাজ কি! তুমি বনেই চল, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবেনা।

পঞ্চক

খুব হবেরে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই,—আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব—আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব—পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব! দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবেনা?

দাদাঠাকুর

আমি রোজই খাই।

পঞ্চক

তবে তুমি আমাকে খেতে বলচনা কেন?

দাদাঠাকুর

আমি কাউকে বলিনে ভাই, নিজে বসে যাই।

পঞ্চক

না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবেনা। আমাকে তুমি হুকুম কর তাহলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলি তর্ক করে মরতে পারিনে।

দাদাঠাকুর

অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেবনা পঞ্চক। যে দিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠ্‌বে সেই দিন আমি হুকুম করব।

(একদল শোণপাংশুর প্রবেশ)

দাদাঠাকুর

কি রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন ?

প্রথম শোণপাংশু

চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর

কে মেরেছে ?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক

আমাদের রাজা ? কেন, মারতে গেল কেন ?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থর-গুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু

আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু

আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়ত ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর

চল তবে।

প্রথম শোণপাংশু

কোথায়?

দাদাঠাকুর

স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

এখনি?

দাদাঠাকুর

হাঁ এখনি।

সকলে

ওরে চল্‌রে চল্‌!

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু

দেব ধূলোয় লুটিয়ে।

সকলে

দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর

ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে

হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চল্‌বে।

সকলে

হাঁ, চল্‌বে, চল্‌বে।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, এ কি ব্যাপার ?

দাদাঠাকুর

এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু

চল, পঞ্চক, তুমি চল।

দাদাঠাকুর

না, না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক

কি জানি ঠাকুর যদিও আমি কোন কর্ম্মেরি না, তবু ইচ্ছে করচে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি!

দাদাঠাকুর

না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করগে।

পঞ্চক

তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয়, ওটাকে বড় করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর

আয়রে, তবে যাত্রা করি।

—০—

৩

অচলায়তন।

(মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম)

বিশ্বম্ভর

আচার্য্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মান্‌ব না।

জয়োত্তম

তিনি বলেন তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেই জন্যে তিনি অপেক্ষা করচেন।

(একটি ছাত্রের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

কি হে তৃণাঞ্জন!

তৃণাঞ্জন

আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কি করব, আমাদের আচার্য্য যে কে তার ত কোনো ঠিক হল না—আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বস্‌ল এর কি করা যায়!

মহাপঞ্চক

সে ত আমি তোমাদের বলে রেখেছি—এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্চে সমস্তই নিষ্ফল হচ্চে।

উপাধ্যায়

শুধু নিষ্ফল হচ্চে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠচে !

সঞ্জীব

এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা !

জয়োত্তম

কিন্তু আমাদের গুরু আসবার ত দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে !

সঞ্জীব

আরে রাখ তোমার তর্ক ! অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্ত্তই যথেষ্ট !

(অধ্যেতার প্রবেশ)

উপাধ্যায়

কিগো অধ্যেতা, ব্যাপার কি ?

অধ্যেতা

তোমরা ত আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে—কিন্তু বসায় কার সাধ্য ?

মহাপঞ্চক

কেন কি বিঘ্ন ঘটেছে ?

অধ্যেতা

মূর্ত্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই !

মহাপঞ্চক

পঞ্চক ?

অধ্যেতা

হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দ্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল!

মহাপঞ্চক

না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চল্‌ল না! অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্ব্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা

আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাইত সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন

আচার্য্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব

স্বয়ং আমাদের আচার্য্য!

বিশ্বম্ভর

ক্রমে এ সব হচ্চে কি! এতদিন এই আয়তনে আছি কখনো ত এমন অনাচারের কথা শুনিনি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্য্যের এই কীর্ত্তি!

জয়োত্তম

তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্ না!

বিশ্বম্ভর

না, না, আচার্য্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক

কি করবে আচার্য্যকে, বলেই ফেল!

বিশ্বম্ভর

তাইত ভাবছি কি করা যায়! তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কি করতে হবে!

মহাপঞ্চক

আমি বলচি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব

কেমন করে?

মহাপঞ্চক

কেমন করে আবার কি? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম

আমাদের আচার্য্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক

হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন

কেন পারব না? আপনি যদি আদেশ করেন তাহলেই—

জয়োত্তম

কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক

শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন

তবে আর ভাবনা কি?

উপাধ্যায়

মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্চে।

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য্য বলে মেনেছ আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করচি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন

তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়!

জয়োত্তম

দেখ তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্ত্তটা ভরিয়ে দিতে হবে! একটু থাম না।

আচার্য্য

গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটেনা ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কি চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও!

পঞ্চক

(ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া)

তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক্ সব শুকনো পাতা— আয়রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো! ভাই জয়োত্তম, শুন্‌চনা, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কররে নৃত্য কর!

(গান)

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কেরে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কেরে!

(প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ)

মহাপঞ্চক

পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বল্‌চি থাম্!

পঞ্চক

(গান)

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কেরে!

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখ্‌চ, কি করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলচেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবেনা!

পঞ্চক

না, থাকবেনা, থাকবেনা, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচরে ও ভাই নাচরে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচরে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দেরে!
তোরে আজ থামায় কেরে!

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি। সর্ব্বনাশ সুরু হয়েছে, বুঝতে পারচ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্ব্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক

সর্ব্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ সুরু হয় দাদা!

মহাপঞ্চক

চুপ্ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়োনা! ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো!

বিশ্বম্ভর

আচার্য্যদেব পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না!

আচার্য্য

না, বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব

ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কত বড় ভাগ্য! মহাতামস ক জন লোকে পারে! ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য্য

গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না! সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন

দেখুন আপনি আমাদের আচার্য্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করচেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য্য

কর, বলপ্রয়োগ কর, আমাকে মেনোনা, আমাকে মার, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারচি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই জন্যেই বলচি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেবনা। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন

পারবে না?

আচার্য্য

না।

মহাপঞ্চক

তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করচ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম

খবরদার—আচার্য্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না!

বিশ্বম্ভর

না, না, মহাপঞ্চক, ওকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব

আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন ?

তৃণাঞ্জন

এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কি হয়েছে !

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র

আমাকে মহাতামস ব্রত করাও !

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ করলে ! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন্ জেগে উঠে চলে এসেছে !

আচার্য্য

বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করচ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন

না, না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব

তুই ধন্য !

বিশ্বম্ভর

তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়

আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে!

মহাপঞ্চক

আচার্য্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্চ?

আচার্য্য

হায়, হায়, এই দেখেইত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখ্‌চি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছেরে! কখন্ সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক

সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য্য

বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র

না, না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক

ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্য্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য্য

না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করচি! সুভদ্র, আচার্য্যের কথা অমান্য কোরোনা—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্য্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক

ধিক্! তোমাদের মত ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন—তাঁরও আর দেখা নেই।

(পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক

রাজা আস্‌চেন।

মহাপঞ্চক

ব্যাপারখানা কি! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে

জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক

কুশল ত?

রাজা

অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্ত দেশের দূতেরা এসে খবর দিল

যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক

দাদাঠাকুরের দল কারা ?

রাজা

ঐ যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক

শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা

সেই জন্যেই ত ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন ?

মহাপঞ্চক

শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব ত আমাদের প্রাচীর রক্ষা করচেন।

রাজা

তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্চে, তোমাদের ক্রিয়া-পদ্ধতিতে স্খলন হচ্চে নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক

আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ!

সঞ্জীব

একজটা দেবীর শাপ ত আর ব্যর্থ হতে পারে না!

রাজা

একজটা দেবীর শাপ! সর্ব্বনাশ। কেন তাঁর শাপ ?

মহাপঞ্চক

যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা

(বসিয়া পড়িয়া)

তবে ত আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক

আচার্য্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্চেন না।

তৃণাঞ্জন

তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা

তবে ত মিথ্যা আমি সৈন্য জড় করতে বলে এলুম। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনি নির্ব্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক

আগামী অমাবস্যায়—

রাজা

না, না, এখন তিথি নক্ষত্র দেখবার সময় নেই! বিপদ আসন্ন। সঙ্কটের সময় আমি আমার রাজঅধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে!

মহাপঞ্চক

হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য্য কে হবে?

রাজা

তুমি, তুমি! এখনি আমি তোমাকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত

করে দিলুম! দিকপালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক

অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্ব্বাসিত করতে চান?

রাজা

আয়তনের বাহিরে নয়—কি জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন! আমার পরামর্শ এই যে আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ কয়দিন সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম

আচার্য্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়? তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি!

মহাপঞ্চক

যিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আচার লঙ্ঘন করেন অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে। মনে কোরোনা আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব—তারও সেইখানে গতি!

রাজা

দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক

কোনো ভয় করবেন না।

—০—

৪

দর্ভকপল্লী।

পঞ্চক

নির্ব্বাসন, আমার নির্ব্বাসনরে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি! কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারচিনে কেন?

(গান)

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে!
তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরাণ মাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে!
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে!

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

দাদাঠাকুর!

পঞ্চক

ওকিও! দাদাঠাকুর বলছিস্ কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক

তোমাদের কি খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক

তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক

সে জন্যে ভাবিস্‌নে ভাই। পেটের ক্ষিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকাল বেলায় করিস্‌ কি বলত! ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক

ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ওসব কিছুই জানিনে! আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসচি কোনো দিন ত তোমাদের পায়ের ধুলা পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ! বলিস্‌ কি! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহলে নির্ব্বাসনের দরকার কি ছিল! তা, সকাল বেলা তোরা কি করিস বল্‌ত।

প্রথম দর্ভক

আমরা শাস্ত্র জানিনে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক

সে কি রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক

ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক

আমিই ত ভাই এত দিন লোক হাসিয়ে আসচি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুসি হয়। আমি যে কি মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাসনি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস্। কিছু ভাবিস্‌নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে!

প্রথম দর্ভক

আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর!

(গান)

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পঞ্চক

দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে!

প্রথম দর্ভক

আমাদের গান?

পঞ্চক

হাঁরে, হাঁ ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না! তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই ত আমার পড়াশুনা কিছু হল না,

আমার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত নিস্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর একটা শোনা—অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না!

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথী!
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেনু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যা কালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

সার্থক হল আমার নির্ব্বাসন।

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো ত এখানে পড়েনি।

আচার্য্য

সে আমার অভাগ্য, সে আমারি অভাগ্য!

দ্বিতীয় দর্ভক

বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে ত—

আচার্য্য

বাবা, তোরাই তুলে আন্‌বি।

প্রথম দর্ভক

আমরা তুলে আন্‌বো—সে কি হয়!

আচার্য্য

হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক

ওরে চল্‌ তবে ভাই চল্‌। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনিগে।

[প্রস্থান]

আচার্য্য

দেখ পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক

আমি ত কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য্য

যখন এই রকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপ-লিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যা বেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধ'রলে—

পারের কণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?

নাম্‌বে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কি ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ—সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ার চড়ে বসা!

পঞ্চক

আমি দেখচি দর্ভক জাতের একটা গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েচে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরতে চায়না। আচার্য্যদেব, কেবল ভাল করে না ডাক্‌তে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাক্‌তে ইচ্ছা করচে। কিন্তু গলা খোলেনা যে—রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু! এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়!

আচার্য্য

সেই জন্যেই ত ভাবচি আমাদের গুরু আসবেন কবে! জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন্—হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন্।

পঞ্চক

মনে হচ্চে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে!

আচার্য্য

ওই পঞ্চক শুন্‌তে পাচ্চ কি?

পঞ্চক

কি বলুন দেখি?

আচার্য্য

আমার মনে হচ্চে যেন সুভদ্র কাঁদচে!

পঞ্চক

এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ!

আচার্য্য

তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখ্‌তে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদচে।

পঞ্চক

এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আব সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বল্‌চে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য্য

ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্চে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক

প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে ঘরে বসালুম সে ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখ্‌তে পাইনে—তবু তিনি সেখানে বসে আছেন!

(গান)

সকল জনম ভোরে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া।

আছ হৃদয় মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

(উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

একি সুভদ্রসোম! আমার কি সৌভাগ্য! কিন্তু তুমি এখানে এলে যে!

উপাচার্য্য

আর কোথা যাব বল? তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কি কঠিন হয়ে উঠল, কি শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারিনে। এখন এস একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য্য

আমাকে ছুঁয়োনা—কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করিনি।

উপাচার্য্য

তা হোক্ তা হোক্। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও!

(কোলাকুলি)

পঞ্চক

উপাচার্য্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে সমস্ত ক্ষমা করে নাও!

উপাচার্য্য

এস বৎস, এস।

(আলিঙ্গন)

আচার্য্য

সুতসোম, গুরু ত শীঘ্রই আসচেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কি করে?

উপাচার্য্য

সেই জন্যেই চলে এলুম। গুরু আসচেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে—এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌তে হবে। ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জ্জিতঘোষসুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মান্‌তে পারব না।

পঞ্চক

আঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি মেঘ করে এল! শুনচ আচার্য্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য্য

ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপনদেখা বৃষ্টি!

পঞ্চক

মিট্‌ল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নীচেকার মাটি!

(ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ)

আচার্য্য

বাবা, তোমাদের এ কি সমারোহ! আজ এ কি কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাইনে আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমরা ত শাস্ত্র কিছুই জানিনে—তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক

কিন্তু আজ দেবতা কি মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক

তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

(মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত)

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকাল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে।

আচার্য্য

পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাক্‌তে হবে—বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরি কোরোনা।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় সরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখ দুঃখ দেব দলে,

ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

(সকলে)

উতল ধারা বাদলঝরে—
দুয়ার খুলে এল ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক

ঐ আবার বজ্র !

আচার্য্য

দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য্য

আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে !

—*—

৫

অচলায়তন ।

মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক

তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন ? কোনো ভয় নেই !

তৃণাঞ্জন

তুমি ত বলচ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে ।

মহাপঞ্চক

একথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ! শিলা জলে ভাসে ! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে ! পাগল হয়েছ !

সঞ্জীব

কে যে বল্লে দেখে এসেছে ।

মহাপঞ্চক

সে স্বপ্ন দেখেছে ।

জয়োত্তম

আজই ত আমাদের গুরুর আসবার কথা ।

মহাপঞ্চক

তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে ; কেবল যে ছেলের মা বাপ ভাই বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আন্‌তে পারলেনা—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়্‌বে ঠিক করতে পারচিনে ।

সঞ্জীব

গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে ? আচার্য্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরাত কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক

আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর

ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসচেন।

মহাপঞ্চক

নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কি করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে ত পাওয়া গেল না।

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

কত দূর ?

উপাধ্যায়

কত দূর কি ? এসে পড়েছে যে !

মহাপঞ্চক

কই দ্বারে ত এখনো শাঁখ বাজালে না ?

উপাধ্যায়

বিশেষ দরকার দেখিনে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখ্‌তে পাচ্চিনে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক

বল কি ? দ্বার ভেঙেছে ?

উপাধ্যায়

শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই!

মহাপঞ্চক

কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়

তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্চে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো!

ছাত্রগণ

কি সর্ব্বনাশ!

সঞ্জীব

কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

তৃণাঞ্জন

আমি ত তখনি বলেছিলুম এ সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথি-পড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়!

বিশ্বম্ভর

কিন্তু এখন করা যায় কি?

তৃণাঞ্জন

আমাদের আচার্য্যদেবকে এখনি ফিরিয়ে আনিগে। তিনি থাক্‌লে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব

কিন্তু দেখ মহাপঞ্চক আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়

সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আস্‌চে।

মহাপঞ্চক

তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্র সূর্য্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্চি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক দেবতার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়

তার চেয়ে দেখি কোন্‌ দিক দিয়ে বেরবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন

আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরবার পথ যে জানিই নে। কোনো দিন বেরতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনি।

সঞ্জীব

শুন্‌চ—ঐ শুন্‌চ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ

কি হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে!

তৃণাঞ্জন

ধর মহাপঞ্চককে! বাঁধ ওকে! একজটাদেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চল!

মহাপঞ্চক

সেই কথাই ভাল। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চল। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়?

(বালকদলের প্রবেশ)

উপাধ্যায়

কিরে তোরা সব নৃত্য করচিস কেন ?

প্রথম বালক

আজ এ কি মজা হল !

উপাধ্যায়

মজাটা কি রকম শুনি ?

দ্বিতীয় বালক

আজ চারদিক থেকেই আলো আসচে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক

এত আলো ত আমরা কোনোদিন দেখিনি !

প্রথম বালক

কোথাকার পাখীর ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্চে।

দ্বিতীয় বালক

এ সব পাখীর ডাক আমরা ত কোনদিন শুনিনি ! এ ত আমাদের খাঁচার ময়নার মত একেবারেই নয়।

প্রথম বালক

আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করচে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা !

মহাপঞ্চক

আজকের কথা ঠিক বলতে পারচিনে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্চে না।

প্রথম বালক

আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ ?

মহাপঞ্চক

হাঁ বন্ধ।

সকলে

ওরে কি মজারে মজা !

দ্বিতীয় বালক

আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই ?

মহাপঞ্চক

না।

সকলে

ওরে কি মজা ! আঃ আজ চারিদিকে কি আলো !

জয়োত্তম

আমারও মনটা নেচে উঠচে বিশ্বম্ভর ! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারচিনে !

বিশ্বম্ভর

আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্চে বিশ্বম্ভর !

সঞ্জীব

কিন্তু ব্যাপারটা যে কি ভেবে উঠ্‌তে পারচিনে ! ওরে ছেলে-গুলো, তোরা হঠাৎ এত খুসি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি !

প্রথম বালক

দেখচনা সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক

মনে হচ্চে ছুটি—আমাদের ছুটি !

তৃতীয় বালক

সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলি আমরা গেয়ে বেড়াচ্চি।

জয়োত্তম

কোন্ গান?

প্রথম বালক

সেই যে—

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা!
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা!
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা!
আলো, আমার আলো ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠ্ল নেচে
মল্লিকা মালতী।

মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

[বালকদের প্রস্থান]

জয়োত্তম

দেখ মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্চে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুসি হয়ে উঠ্‌ল কেন?

মহাপঞ্চক

ভয় নেই সে ত আমি বরাবর বলে আসচি।

(শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ)

উভয়ে

গুরু আস্‌চেন।

সকলে

গুরু!

মহাপঞ্চক

শুনলে ত! আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা!

সকলে

ভয় নেই আর ভয় নেই!

তৃণাঞ্জন

মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে!

সকলে

জয় আচার্য্য মহাপঞ্চকের।

(যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

শঙ্খবাদক ও মালী

(প্রণাম করিয়া)

জয় গুরুজীর জয়!

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়

তাইত শুনচি।

মহাপঞ্চক

তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর

হাঁ! তুমি আমাকে চিন্‌বে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু!

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মান্‌বে?

দাদাঠাকুর

আমাকে মান্‌বে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু!

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর

এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক

কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর

তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি!

মহাপঞ্চক

তুমি কি মনে করেচ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মান্‌ব?

দাদাঠাকুর

না, এখনি না! কিন্তু দিনে দিনে হার মান্‌তে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক

আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবচ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

দাদাঠাকুম

আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু!

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে না কি?

উপাধ্যায়

দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক

না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর

আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব!

মহাপঞ্চক

তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক

তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর

এরা আমার অনুবর্ত্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে

শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক

এরাই তোমার অনুবর্ত্তী!

দাদাঠাকুর

হাঁ।

মহাপঞ্চক

এই মন্ত্রহীন কর্ম্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর

এস ত, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও! এদের কর্ম্মকাণ্ড কি রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী!
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী।
এই জন্ম মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে
সাগর গিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক

আমি এই আয়তনের আচার্য্য—আমি তোমাকে আদেশ করচি তুমি এখন ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর

আমি যাকে আচার্য্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এস আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়

এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্চে।

প্রথম শোণপাংশু

অচলায়তনের দরজার কথা বলচ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়

বেশ করেছ ভাই! আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক

পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু

এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক

কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই!

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগ্‌বে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর

শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

(বালকদলের প্রবেশ)

সকলে

তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর

হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে

আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর

বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ কর!

প্রথম বালক

ঠাকুর, তুমি আমাদের কি করবে ?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের সঙ্গে খেল্‌ব ।

সকলে

খেল্‌বে ?

দাদাঠাকুর

নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের ?

সকলে

কোথায় খেল্‌বে ?

দাদাঠাকুর

আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক

মস্ত ! এই ঘরের মত মস্ত ?

দাদাঠাকুর

এর চেয়ে অনেক বড় ।

দ্বিতীয় বালক

এর চেয়েও বড় ? ঐ অঙিনাটার মত ?

দাদাঠাকুর

তার চেয়ে বড় ।

দ্বিতীয় বালক

তার চেয়ে বড় ! উঃ কি ভয়ানক !

প্রথম বালক

সেখানে খেল্‌তে গেলে পাপ হবে না ?

দাদাঠাকুর

কিসের পাপ ?

দ্বিতীয় বালক

খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না ?

দাদাঠাকুর

না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে

কখন্ নিয়ে যাবে ?

দাদাঠাকুর

এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম

(প্রণাম করিয়া)

প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর

সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও !

সঞ্জীব

মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না !

মহাপঞ্চক

না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী।

পঞ্চক

(গান)

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে!
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে!
পালে আমার লাগ্‌ল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাইরে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাইরে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌ল পাথায়
পাখী কি আর থাকবে শাথায়?
দিকে দিকে সাড়া যে পাইরে!

(আচার্য্যের প্রবেশ)

পঞ্চক

দূরে থেকে নানা প্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আচার্য্যদেব! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চল্‌চে।

আচার্য্য

সময় ত হয়েছে। কালই ত তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার সুতসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক

তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

পঞ্চক

কি ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক

শুনচি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য্য

লড়াই কিসের? আজ ত গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক

না, না, লড়াই হচ্চে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক

বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য্য

ওখানে ত লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক

লোক ত আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক

শুনেছি কত রকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়চে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য্য

তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক

হয়ত বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয় ত যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক

আমরা শুনেছি কে বল্‌ছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য্য

গুরুও এসেছেন? সে কি রকম হল?

পঞ্চক

তবে লড়াই কর্‌তে কারা এসেছে বল্‌ ত?

প্রথম দর্ভক

লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক

দাদাঠাকুরের দল! বল্‌ বল্‌ শুনি ঠিক বল্‌ছিস্‌ ত রে?

দ্বিতীয় দর্ভক

হাঁ, সকলেই ত বল্‌চে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক

ওরে কি আনন্দরে কি আনন্দ!

আচার্য্য

এ কি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এ রকম উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন ?

পঞ্চক

প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তাহলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে !

আচার্য্য

পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। তুমি দাদাঠাকুর বল্‌চ কাকে ?

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বল্‌বনা প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন, তাহলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, হুকুম কর, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক

আয়না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চল্‌বরে !

দ্বিতীয় দর্ভক

তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর ?

পঞ্চক

হাঁ, লড়ব।

আচার্য্য

কি বল্‌চ পঞ্চক ! তোমাকে লড়তে কে ডাক্‌চে ?

পঞ্চক

আমার প্রাণ ডাক্‌চে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু! যেন কেবলি স্বপ্ন দেখচি—আর যতই জোর করচি কিছুতেই জাগ্‌তে পারচিনে। কেবল এমন বসে বসে হবেনা দেব! একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাট্‌বেনা।

(গান)

আর নহে আর নয়।
আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফল্‌ল সাধন
হল বাঁধন ক্ষয়।
ঐ আকাশে ঐ ডাকে
আমায় আর কে ধরে রাখে!
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।
ওরা বসে বসে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কি যে গোণে ঘরের কোণে
আমায় ডাকে পিছে!
আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

(মালীর প্রবেশ)

মালী

আচার্য্যদেব, আমাদের গুরু আস্‌চেন।

আচার্য্য

বলিস্‌ কি? গুরু? তিনি এখানে আস্‌চেন? আমাকে আহ্বান করলেই ত আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক

এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক

বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বস্‌বার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

(আর একদল দর্ভকের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আস্‌বে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক

হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝল্‌সে যায়।

তৃতীয় দর্ভক

ঘরে কি আছেরে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক

বনের জাম আছেরে।

চতুর্থ দর্ভক

আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক

কালো গোরুর দুধ শীগ্‌গির দুয়ে আন্ দাদা।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

আচার্য্য

(প্রণাম করিয়া)

জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক

একি! এযে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল

গোসাঁই ঠাকুর! প্রণাম হই! খবর দিয়ে এলেনা কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর

কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোষ করতে আরম্ভ করেছিস্ নাকিরে?

প্রথম দর্ভক

আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর

আমারো তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিন্‌তে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক

ঐ ত আমাদের গোসাঁই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান]

দাদাঠাকুর

আচার্য্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য্য

কি যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি!

দাদাঠাকুর

যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ!

আচার্য্য

কিন্তু বাঁধতে ত পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধচি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি!

দাদাঠাকুর

যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য্য

তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায়নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুল্‌তে হয়। তাই দিন রাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি!

দাদাঠাকুর

তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেই-খানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য্য

আদেশ কর প্রভু! ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলচি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়চি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর

যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য্য

ধন্য করেছ!—কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করচ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর

এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা ত সহজ ক'রে রাখনি।

পঞ্চক

ভালই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবচি তোমাকে ডাক্‌ব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর

যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চল্‌তে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক

প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই! আমাকে আমিই চালাচ্চি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্চ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জান্‌তে চাই। আমি শোণপাংশু না তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারি বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর!

দাদাঠাকুর

আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক

কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর

ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক

আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর

কারাগার যা ছিল সে ত আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুল্‌তে হবে।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বল্‌চি আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়োনা। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে—তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখিনি।

দাদাঠাকুর

ভয় নেই পঞ্চক! অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখ্‌তে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাক্‌বার দিন এখন চিরকালের মত ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক

কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবেনা প্রভু!

দাদাঠাকুর

আমি বল্‌চি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক

কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, এক্‌লা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর

ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্চে না, সেই জন্যেই ওখানে

তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্চে বলেই তুমি ওদের ঠেল্‌তে পারবে না।

পঞ্চক

আমাকে কি করতে হবে?

দাদাঠাকুর

যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আন্‌তে হবে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলবে?

দাদাঠাকুর

না যদি কুলয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িয়োনা।

পঞ্চক

শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর

হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বস্‌তে শিখুক্।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা! সর্ব্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে! ওরা যে কেবল ছট্‌ফট্ করাকেই মুক্তি মনে করে!

দাদাঠাকুর

ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুসি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিষ বলে জানে—কিন্তু জানেনা স্থির হ'য়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা

বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিক্‌টাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক

তাহ'লে আমার মহাপঞ্চদাদাকে কি ঐখানেই—

দাদাঠাকুর

হাঁ ঐখানেই বই কি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চল্‌ছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখ্‌তেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নেই। কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য্য

আর এই চির অপরাধীর কি বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর

তোমাকে আর কাজ করতে হবেনা আচার্য্য! তুমি আমার সঙ্গে এস!

আচার্য্য

বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে! আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হ'য়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আন। আমি কোন সম্পদ চাইনা—আমাকে একটু রস দাও!

দাদাঠাকুর

ভাবনা নেই আচার্য্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—

তার ঝর্ ঝর্ শব্দে মন নৃত্য করচে আমার! বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখ্‌তে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্চে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপচে কারা! এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জ্জনে আনন্দ! আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় ত উড়ে যাক্, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক্—আজ দুর্য্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক্ না—আজ একেবারে বড় রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন!

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র

গুরু!

দাদাঠাকুর

কি বাবা!

সুভদ্র

আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর

তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র

বাকি নেই?

দাদাঠাকুর

না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র

একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর

একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা

দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হ'য়ে গেল যে সে আর কোনদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখ্‌লে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র

এখন আমি কি করব ?

পঞ্চক

এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

উপাচার্য্য

(প্রবেশ করিয়া)

তৃণ পাওয়া গেল না—কোথায়ও তৃণ পাওয়া গেল না!

আচার্য্য

সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে ?

উপাচার্য্য

হাঁ, ইন্দ্র তৃণ, সে ত কোথাও পাওয়া গেল না! হায়, হায়! এখন আমি করি কি! এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য্য

থাক্ তোমার তৃণ! এদিকে একবার চেয়ে দেখ!

উপাচার্য্য

এ কি! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই দর্ভকদের পাড়ায়! এখন উপায় কি ? ওঁকে কোথায়—

(দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

গোঁসাই এই সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পশু পিঠে তৈরি করেছিল তারি কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য্য

আরে, আরে সর্ব্বনাশ করলে রে! করিস্ কি! উনি যে আমাদের গুরু!

দ্বিতীয় দর্ভক

তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ ত আমাদের গোঁসাই!

দাদাঠাকুর

দে ভাই, আর কিছু এনেছিস্?

দ্বিতীয় দর্ভক

হাঁ জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক

কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর

সব এখানে রাখ্। এস ভাই পঞ্চক, এস আচার্য্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য্য আর পুরাতন আচার্য্য এসো, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি!

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে

গুরু!

দাদাঠাকুর

এস বাছা, তোমরা এস!

প্রথম বালক

কখন্ আমরা বের হব ?

দাদাঠাকুর

আর দেরি নেই—এখনি বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক

এখন কি করব ?

দাদাঠাকুর

এই যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে !

প্রথম বালক

ও ভাই এই যে জাম—কি মজা !

দ্বিতীয় বালক

ওরে ভাই খেজুর—কি মজা !

তৃতীয় বালক

গুরু, এতে কোন পাপ নেই ?

দাদাঠাকুর

কিছু না—পুণ্য আছে !

প্রথম বালক

সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব ?

দাদাঠাকুর

হাঁ এইখানেই।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

দাদাঠাকুর !

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আর তো পারিনে! দেয়াল ত একটাও বাকি রাখিনি। এখন
ক করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে!

দাদাঠাকুর

ভয় নেই রে! শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না! তোদের কাজ দেব।

সকলে

কি কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর

আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথ্‌তে লেগে যেতে হবে।

সকলে

বেশ, বেশ, রাজি আছি!

দাদাঠাকুর

ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে

হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর

সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেল তোমরা দুইদলে লাগ তোমাদের কাজে!

সকলে

তাই লাগ্‌ব! পঞ্চকদাদা, তাহলে তোমাকে উঠ্‌তে হচ্চে, অমন

করে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বেনা। ত্বরা কর! আর দেরি না!

পঞ্চক

প্রস্তুত আছি! গুরু তবে প্রণাম করি! আচার্য্যদেব, আশীর্ব্বাদ কর!

(সমাপ্ত)

3660
12/83
IMPERIAL LIBRARY